চিন্তন

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলন : বিশ্বজনীনতা ও শ্রীশ্রীমা

প্রব্রাজিকা ভাস্বরপ্রাণা

এখানে শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ দুটি নামের একত্রে উচ্চারণ অর্থহীন মনে হতে পারে। শুধু রামকৃষ্ণ ভাবান্দোলন বললেই তো হয়—কারণ স্বামীজী তো বলেইছেন যে তিনি একটিও নতুন কথা বলেননি। শ্রীরামকৃষ্ণের সব মৌলিক ভাবনাচিন্তাই কার্যকরী হয়েছে। এ-স্বীকারোক্তি লক্ষ করেই বোধহয় প্রখ্যাত সাহিত্যিক মুজতবা আলি বলেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেব না থাকলে নরেন্দ্রনাথ দত্তের বিবেকানন্দ হওয়া হত না। যে-উদার ধর্মবোধ, সমন্বয়বার্তা, হিন্দুধর্মের উপনিষদভিত্তিক উদার গণতান্ত্রিক ধর্মচেতনায় একতার তত্ত্ব ও তার সাধন—যা শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ জীবনে সাফল্যের সঙ্গে কার্যকরী করে এক যুগান্তকারী নবজাগরণের বার্তা সর্বজগতের জন্য রেখে গেছেন, বিবেকানন্দ তাকেই প্রচার ও প্রসার করেছেন। নিজ জীবনখানি তারই ছাঁচে একেবারে নিখুঁতভাবে তৈরি করেছেন—অবশ্য তার পেছনেও রয়েছে তাঁর গুরুরই অকৃপণ সহায়তা, প্রেমপূর্ণ ধৈর্য ও সহানুভূতি—শিষ্যকে বিশ্বের কল্যাণে তৈরি করার প্রাণপণ চেষ্টা।

একথার গ্রহণযোগ্যতা মান্য করেও বিশ্বের দরবারে এই মহান ভাবপ্রচারের কৃতিত্ব স্বামী বিবেকানন্দকেই দিতে হবে। স্বামীজী লিখেছেন, ‘বাণী তুমি, বীণাপাণি কণ্ঠে মোর’। কণ্ঠটি তিনিই দিয়েছেন। বীজটি অবশ্য শ্রীরামকৃষ্ণই বপন করেছেন, কিন্তু তাকে পত্রে পুষ্পে ফলবান বৃক্ষের মহিমায় সমৃদ্ধ করার কৃতিত্ব অবশ্যই স্বামীজীর। যে-সমন্বয়ী ধর্মসাধন ও সিদ্ধি কয়েকজন মুষ্টিমেয়র মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে ছিল, তাকে বিশ্বের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে ছড়িয়ে দেওয়ার কৃতিত্বের অধিকারী বিবেকানন্দই, তাই তাঁর নামটি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে একই গুরুত্বের সঙ্গে উচ্চারিত হওয়ার যোগ্য।

প্রখ্যাত প্রাবন্ধিক রামচন্দ্র গুহ স্বামীজীকে ইতিহাসে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন একজন Hindu revivalist বলে। একথা এক অর্থে সত্য, কিন্তু সর্বাংশে নয়। এককালে যে-ধর্মের ধ্বজা ধরে চূড়ান্ত সাম্প্রদায়িক বিভাজন শুরু হয়েছিল, তাকেই স্বামীজী নবরূপ দান করাতে তা সব ধর্মেরই মিলনভূমি হয়ে গেল। নিবেদিতা ভারি সুন্দর লিখেছেন : শিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামীজী হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে বলতে উঠে তার পরিচয় ও ব্যাখ্যা দেন;

প্রাক্তন অধ্যক্ষা, রামকৃষ্ণ সারদা মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যাভবন

তিনি যখন ভাষণ শেষ করেন তখন 'Hindu religion was created'. একে আজকের পরিভাষায় Deconstruction বলা যায়। Deconstruction স্বামীজীর এক অপূর্ব অবদান। এতদিন হিন্দুধর্মে আত্মমুক্তি ও জগতের কল্যাণ দুটি পৃথক পথ বলে চিহ্নিত ছিল, শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজীর হাতে তা যেন একসঙ্গে মিলে গিয়ে এক নবরূপ পেল এবং এই সূত্রেই তার বিশ্বজনীনতা গ্রাহ্য হয়ে গেল।

দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুমিত সরকার বলেছেন, সমাজসেবার কথা শ্রীরামকৃষ্ণ বলে যাননি, এটি স্বামীজীর সংযোজন। কারণ রামকৃষ্ণদেব শম্ভু মল্লিককে বলেছিলেন, "এটি যেন মনে থাকে যে, তোমার মানবজন্মের উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ। হাসপাতাল, ডিস্পেনসারি করা নয়! মনে কর ঈশ্বর তোমার সামনে এলেন; এসে বললেন, তুমি বর লও। তাহলে তুমি কি বলবে, আমায় কতকগুলো হাসপাতাল ডিস্পেনসারি করে দাও, না বলবে—হে ভগবান, তোমার পাদপদ্মে যেন শুদ্ধাভক্তি হয়, আর যেন তোমাকে আমি সর্বদা দেখতে পাই। হাসপাতাল, ডিস্পেনসারি—এসব অনিত্য বস্তু। ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু। তাঁকে লাভ হলে আবার বোধ হয়, তিনিই কর্তা আমরা অকর্তা। তবে কেন তাঁকে ছেড়ে নানা কাজ বাড়িয়ে মরি? তাঁকে লাভ হলে তাঁর ইচ্ছায় অনেক হাসপাতাল, ডিস্পেনসারি হতে পারে। তাই বলছি, কর্ম আদিকাণ্ড। কর্ম জীবনের উদ্দেশ্য নয়... ঈশ্বরলাভই জীবনের উদ্দেশ্য।" অতএব কর্মের মধ্য দিয়ে মানুষের কল্যাণসাধনের বার্তা শ্রীরামকৃষ্ণ দেননি। কিন্তু রামকৃষ্ণদেব যে স্বামীজীকে শিবজ্ঞানে জীবসেবার কথা বলেছেন, তা কি মিথ্যা? তিনিই তো তাঁকে নিজের ধ্যান ও মুক্তির কথা ভাবার জন্য তীব্র তিরস্কার করেছেন, তার ব্যাখ্যা কী? স্বামীজী তো স্বীকার করেছেন যে গুরুর দ্বারাই তিনি অনুপ্রাণিত হয়ে কর্মযোগের কথা ভেবেছেন, তাকে ধর্মের অঙ্গরূপে সমাজে ব্যাবহারিক প্রয়োগ করতে চেয়েছেন এবং এখানেও এক অসাধারণ মৌলিক ভাবনার জন্ম দিয়ে ব্যাবহারিক বেদান্তের প্রচলন করে গেছেন।

প্রখ্যাত জার্মান দার্শনিক মার্টিন কেম্পশেন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ অনুরাগীদের অন্যতম। তিনি দীর্ঘদিন রামকৃষ্ণ মঠের বিভিন্ন শাখাকেন্দ্রে বিশেষ করে নরেন্দ্রপুরে বাস করেছেন ও সাধুসঙ্গে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য পড়েছেন। তিনি লিখেছেন, রামকৃষ্ণদেবকে নিয়ে দুটি ঘরানার সৃষ্টি হয়েছে। একটি ভক্তির ঘরানা—সেটিতে ভক্তরা তাঁর জীবন ও বাণীকে ভক্তির আলোকে বিবেচনা করে তাঁর অবতারত্ব প্রমাণের সপক্ষে প্রচার করেছেন; আর একটি হল বিচার-বিশ্লেষণের ঘরানা, যেখানে বিজ্ঞানসম্মত বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাঁর বাণী ও কার্যাবলিকে, তৎকালীন সমাজ ও জাতির ইতিহাসের প্রেক্ষিতে ফেলে নির্মোহভাবে তুলে ধরা হয়েছে। মার্টিন কেম্পশেন এই দ্বিতীয় ঘরানার পক্ষে নিজের রায়টি দিয়েছেন।

স্বামী সারদানন্দজীও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ লিখতে গিয়ে জানিয়েছেন, ভক্তির আধিক্যে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন নিয়ে অলৌকিকতার যে-বাড়াবাড়ি হচ্ছিল তার প্রতিরোধকল্পেই তিনি নিজে কলম ধরেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণের অপূর্ব জীবনকথা বিচার-বিশ্লেষণে অগ্রসর হয়েছেন। তবে আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও নিজ আধ্যাত্মিক অনুভূতি ছাড়া এসবের যথার্থ মূল্যায়ন হতে পারে না। সাধারণ মানুষের শুধু যুক্তিবিচার প্রয়োগে এসব উচ্চতম ধর্মীয় জীবনকে অনুভব করার সামর্থ্য থাকে না, তাই তাতে ভুলভ্রান্তি থাকাই যে স্বাভাবিক তা আর বলার অপেক্ষা থাকে না।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবাদর্শ প্রধানত ধর্মীয় বা অধ্যাত্মতত্ত্বভিত্তিক এবং একইসঙ্গে তা সমাজ বা জনকল্যাণমূলক। নিবেদিতা বলেছেন, যদি এক ও

বহুর ভিত্তিভূমি এক আত্মা হয়—যেমন বেদান্ত বলছে—তবে তার বিভিন্ন প্রকাশেও সে অভিন্ন হবে; তাই শ্রম ও সাধনায় আর পার্থক্য কী? To labour is to pray, to conquer is to renounce. মানবজীবন একটানা ধর্ম ও কর্মের মিলনভূমি, যার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সমগ্র মানবসমাজ—সার্বিক প্রেমপ্রীতি, সেবা ও সহযোগিতার ভিত্তিতে। স্বামীজী বলেছেন এই সেতুবন্ধনই জগৎ জয়ে সক্ষম, যা ধর্ম ও কর্মকে শুধু সাম্প্রদায়িক বা দেশজ সংস্কৃতির মধ্যে আবদ্ধ না রেখে বিশ্বমঞ্চে স্থান করে দিতে পারে। রামকৃষ্ণদেব নিজ জীবনকে এর জীবন্ত দৃষ্টান্ত করে আমাদের কাছে রেখে গেছেন। নিবেদিতা বলেছেন তাঁর জীবন একটি 'mini Parliament of Religions'; এর ভিত্তিতেই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলনের উদ্দেশ্য হল এক অখণ্ড, বিশ্বজনীন মানবপরিবার গঠন—এটিই স্বামীজীর মতে সাধন ও সিদ্ধি।

পাশ্চাত্য দার্শনিক ও চিন্তাবিদ গবেষক ইশারউড মন্তব্য করেছেন, এই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারা শুধু প্রতিষ্ঠানগতভাবে আটকে পড়েনি, এটি বিশ্বজনীনতার মর্যাদা লাভ করেছে। এইসব কারণে (১) শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে অধ্যাত্মসত্যগুলি পূর্ণভাবে অভিব্যক্ত বা প্রতিফলিত হয়েছে, যা প্রমাণিত সত্যের পর্যায়ে পড়েছে। আর এইজন্যই শুধু মতবাদে পরিণত না হয়ে সত্যের মর্যাদা লাভ করেছে। মতবাদ ভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু সত্য সর্বজনগ্রাহ্য, তা কোনওকালেই ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হয় না। (২) এর মধ্য দিয়ে মানবজাতির প্রতি যে-সাম্যবোধ, যৌক্তিকতা, সম্ভ্রম, শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে, তা সকলকেই স্পর্শ করেছে। (৩) ধর্মান্তরীকরণের দ্বারা যে-ধর্মীয় একচ্ছত্রবাদ বা ধর্মীয় সাম্রাজ্যবাদের সম্ভাবনা, তার মূলোচ্ছেদ করেছে এই ভাবধারা। (৪) সর্বপ্রকার রাজনীতির সঙ্গে সংস্রবমুক্ত হওয়ায় এতে সীমান্তগত সীমাবদ্ধতাও সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়েছে।

ইউনেস্কো শিকাগো ধর্মমহাসভার শতবর্ষপূর্তিতে একটি সভার আয়োজন করেন ১৯৯৩ সালে। তাতে ইতিহাসবিদ নিমাইসাধন বসু প্রতিনিধি হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি ফিরে আমাদের জানিয়েছিলেন, ইউনেস্কো-র ডিরেকটর ফ্রেডারকো মেয়র তাঁর প্রারম্ভিক ভাষণে ইউনেস্কো-র অনুষ্ঠান করার যুক্তি দেখিয়ে বলেছেন, তিনি বিশেষভাবে স্বামী বিবেকানন্দকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে চেয়েছেন কারণ স্বামীজী (ক) ১৮৯৭ সালে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার যে-উদ্দেশ্য ও আদর্শের কথা বলেছিলেন এবং তাকে বৃহত্তর সমাজের ক্ষেত্রে অবিলম্বে প্রয়োগ করতে শুরু করে দিয়েছিলেন, ইউনেস্কো তার প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে ১৯৪৫ সালে সেইসব জনসেবামূলক আদর্শকেই কার্যকরী করার পরিকল্পনা করে। স্বামীজী সেই মহাসভার ঘণ্টাধ্বনিকে লক্ষ করে বলেছিলেন, এটি "death-knell of all fanaticism, of all persecutions with the sword

or with the pen, and of all uncharitable feelings between persons wending their way to the same goal.” সেটিকেই ইউনেস্কো তার স্লোগান করেছে। (খ) সমাজে শ্রমজীবী ও নারীর সর্ববিধ উন্নতিসাধন স্বামীজীর মিশনের উদ্দেশ্য। ইউনেস্কো দীর্ঘদিনের ব্যবধানে তাকেই গ্রহণ করেছে। (গ) দেশ, জাতি, ধর্ম ও সংস্কৃতি-নিরপেক্ষভাবে সকলকে শিক্ষাদান, ঐতিহ্যগত ও বিজ্ঞানভিত্তিকভাবে—সেটিকেও ইউনেস্কো গ্রহণ করেছে।

এখানে আমাদের মনে রাখতে হবে যে ঊনবিংশ শতকের প্রথমেই যে-রেনেসাঁ এসেছিল পাশ্চাত্যে অর্থনৈতিক সাম্য ও মর্যাদার হাত ধরে, ভারতেও তার প্রভাব পড়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রমুখের রচনায় প্রগতির হাওয়া বইতে দেখা যায়। তবে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের হাত ধরেই কিন্তু ধর্মের দিক দিয়ে নবজাগরণের সূচনা হয় এখানে। রাজা রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তনের মাধ্যমে খানিকটা ওই পথে এগোলেও, যেহেতু হিন্দুধর্মের ঐতিহ্যগত প্রতিমাপূজা, পুরাণাদি পাঠ বন্ধ করতে চেয়েছিলেন, তাই তাঁদের প্রয়াস পূর্ণভাবে মানুষের হৃদয় স্পর্শ করেনি। প্রথম রামকৃষ্ণদেবই প্রাচীন ধর্মকে রেখেই উপনিষদ-ভিত্তিক সাম্য বা একাত্মবাদকে নিজজীবনে প্রমাণ করে তার প্রচারে ব্রতী হন। পাশ্চাত্যের নবজাগরণ নরকে নরোত্তমের পর্যায়ে তুলেছিল, শ্রীরামকৃষ্ণ তাকে নারায়ণের উচ্চতায় উন্নীত করলেন, এই অকাট্য যুক্তিতে যে—মাটির প্রতিমায় দেবতার পূজা হয়, আর মানুষে হয় না! মানুষ যে তাঁর চলন্ত জীবন্ত বিগ্রহ! এটিকেই আমি বলতে চেয়েছি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দান, এটিকেই বর্তমান পরিভাষায় Deconstruction বলা যায়। এর সম্পূর্ণ কৃতিত্ব দিতে হবে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ এবং অবশ্যই শ্রীমা সারদা দেবীকে।

আমরা দেখি, শ্রীশ্রীমা এই উদ্দেশ্যেই তাঁর জীবন, বাণী ও কর্মকে পরিচালিত করে গেছেন। তাঁর একটি বাণীকে masterpiece বলা যায় : ‘‘কেউ পর নয়, জগৎ তোমার। জগতকে আপনার করে নিতে শেখো।’’ শুধু কথায় নয়, জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে এই নারী সীমান্তের বেড়াটি অনায়াসে অতিক্রম করে গেছেন শুধু হৃদয়ের অনাবিল প্রেমপ্রীতি, সহানুভূতি ও সহমর্মিতা দিয়ে। যে-অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বজীবের আত্মৈকত্ব সাধনের পথটি দেখিয়ে গেছেন, তা হয়তো শুধুমাত্র শুষ্ক জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রেই আটকে থাকত, যদি শ্রীশ্রীমা প্রেম-ভালবাসা দিয়ে তার অন্তরের দিকটি খুলে না দিতেন, নিজে সর্বভূতে সেই অপার্থিব, নিষ্কাম ভালবাসা ঢেলে না দিতেন, তাকে সর্বজনের কাছে আদরণীয় করে না তুলতেন। স্বামী ভূতেশানন্দজী বলেছেন, এই মহান ভাবান্দোলনের ক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে শ্রীশ্রীমা সমস্তরেই থেকেছেন, তিনি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের পরিপূরক হয়ে অবস্থান করছেন। স্বামীজী যে অদ্বৈতভাব বহির্বিশ্বে প্রচার করেছেন, মা একটি পারিবারিক আবেষ্টনীর মধ্যে থেকেই তা সাধিত করেছেন। মা যদি এতে অংশগ্রহণ না করতেন তাঁর প্রেম, সেবা, সহানুভূতি নিয়ে, তবে ঠাকুর-স্বামীজীর বেদান্ত শুধু মস্তিষ্কের চর্চায় পরিণত হত; হয়তো শংকরাচার্যের অদ্বৈত বেদান্তেরই এক সম্প্রসারিত তত্ত্বরূপেই প্রতিষ্ঠা পেত, এমন হৃদয়গ্রাহী হত না, এমন আনন্দদায়কও হত না।

পাশ্চাত্যে রেনেসাঁ ঊনবিংশ শতকের প্রারম্ভেই অর্থনৈতিক সাম্যকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত হয়েছিল, ভারতে তা পরে নবজাগরণরূপে সংস্কৃতি, সাহিত্য ও ধর্মের ক্ষেত্রেও কিছু অংশে দেখা দিল। পাশ্চাত্যে নারী ও শ্রমজীবীদের উন্নয়নের লক্ষ্যেই প্রধানত এই হাওয়া বয়েছিল। এদেশে ধর্মের ক্ষেত্রে সেই নব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব,

কারণ তিনিই প্রচলিত ধর্মের আচার-অনুষ্ঠানভিত্তিক ধর্মের খোলস থেকে দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত তত্ত্বের সমন্বয়ে এক নতুন ধারণার জন্ম দিয়ে এসব মতবাদের মধ্যে সাম্য স্থাপন করলেন; জাতপাত, কুসংস্কার গোঁড়ামির মূলোচ্ছেদ করে নিজ জীবনে তাঁর এই উদার বিশ্বজনীন ধর্মের সাধন ও সিদ্ধিলাভ করে এক নব দৃষ্টিভঙ্গি দান করলেন। এই ছিল ভারতবাসীর ক্ষেত্রে প্রকৃত নবজাগরণ।

মনে রাখতে হবে মতবাদ ও সত্যের পার্থক্যটিকে। মতবাদ বিশ্বজনীনতা পায় না, কারণ সর্বদা এই সম্ভাবনা থেকেই যায় যে এই মতটি পরবর্তীতে ভুল প্রমাণিত হতে পারে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পরীক্ষিত মতটিতে প্রায়শই তা হয়ে থাকে। যেমন আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্ব নিয়ে ইতোমধ্যেই সংশয় শুরু হয়েছে। কিন্তু সত্য কখনও প্রত্যাখ্যাত হয় না। যেটি realised truth, যেমন ঋষিদের দ্বারা উপলব্ধ যে প্রত্যক্ষিত সত্য, তা আজও অম্লান। যে-কেউ তার চর্চা বা সাধনা করবে, তারই উপলব্ধি হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলন দুটি স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে আছে—এক, অদ্বৈত সত্যের অনুভূতি—এক চৈতন্যসত্তা বা ঈশ্বর সর্বভূতে, বাহ্যিক পার্থক্য appearance মাত্র; দুই—তারই অনুসন্ধান শিবজ্ঞানে জীবসেবার মাধ্যমে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে সব কাজ করতে, কী ব্যাবহারিক কী ধর্মীয়। এমন সমন্বয়ের বাণীই জগতে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে এবং এর সত্যতা কেউ খণ্ডন করতে পারবে না। আবার শ্রীশ্রীমা যদি এতে অংশগ্রহণ না করতেন সকলের প্রতি সমান নির্মল প্রেমপ্রীতি নিয়ে, তবে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রচারিত অদ্বৈততত্ত্ব বেদান্তেরই এক সম্প্রসারিত তত্ত্ব বলে গৃহীত হত মাত্র—এত appealing হত না।

স্বামী বিবেকানন্দ হয়তো এই ভেবেই লিখেছেন ‘প্রেমার্পণ সমদরশন’—জ্ঞানে সমদর্শিতা যুক্তিবিচারে বা logic-এ আয়ত্ত হতে পারে, কিন্তু তা সকলের কাছে সহজলভ্য নয়, বা তা দুরূহ বা শুষ্ক হতে পারে। তাকে ভালবাসার প্রলেপ দিয়ে হৃদয়নির্ভর করতে মা-ই শিখিয়েছেন। হৃদয়ের আবেদনে সকলেই সাড়া দেয়। মায়ের উক্তিই রয়েছে, সেবায় তথা ভালবাসায় বনের হিংস্র জন্তু পর্যন্ত বশ হয়। এখানেই শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দকে ছাড়িয়ে শ্রীশ্রীমা এই ভাবান্দোলনের বিশ্বজনীনতায় একটি বিশেষ স্থান গ্রহণ করে স্বমহিমায় স্থিত হয়ে আছেন ও থাকবেন। ✠

লেখকের প্রতি

* লেখা পাঠাতে হবে ই-মেলে (nibodhatapatrika@gmail.com), pdf করে। ডাকে অথবা হাতে দিলে লেখার একটি নকল অবশ্যই নিজের কাছে রাখুন।
* লেখার সঙ্গে আপনার নাম, ঠিকানা, মোবাইল নম্বরের উল্লেখ অবশ্যই করুন।
* আগে কোথাও ছাপা হয়েছে এমন লেখা পাঠাবেন না।
* শুধু ধর্মীয় প্রসঙ্গ নয়—দর্শন, সাহিত্য, শিল্প, ইতিহাস, স্বাস্থ্য, বরেণ্য সাধক ও মহাপুরুষদের কথা নিয়ে ইতিবাচক লেখা আমরা প্রকাশ করি। প্রবন্ধ ১৫০০ থেকে ২৫০০ শব্দের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়।
* প্রবন্ধে প্রকাশিত তথ্যের জন্য তথ্যসূত্র অবশ্যই দিতে হবে। সেক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ক্রম অনুসরণ করুন : লেখকের নাম, বইয়ের নাম, প্রকাশনা সংস্থার নাম, প্রকাশের স্থান ও বর্ষ, খণ্ড বা ভাগ (যদি থাকে) এবং পৃষ্ঠা।

—সম্পাদিকা